ভারতের বিদেশনীতিতে বাংলাদেশ : জাতীয় নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিকতা

গবেষক : কৌশিক বৈদ্য

রেজিস্ট্রেশন নং : A00IR1200315

তত্বাবধায়ক :

অধ্যাপক ইমনকল্যাণ লাহিড়ী

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা - ৭০০ ০৩২

ভূমিকা

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের প্রতি ভারত রাষ্ট্রের মনোভাব বরাবরই একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে এবং তা হল ভারত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক স্বার্থ। ফলত নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ কখনোই সেই ভূমিকা নেয়নি— যা নয়াদিল্লিকে সমস্যার মধ্যে ফেলবে। বাংলাদেশ এই কারণে সেই সকল দেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ যোগাযোগ স্থাপন থেকে বিরত থেকেছে, যা এই উপমহাদেশে কোনো তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিকে সম্ভবপর করে তুলতে পারে। একই কারণে ভারতবর্ষের সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে হানিকর হতে পারে, এমন কোনো প্রতিরক্ষা বিষয়ক চুক্তিতে বাংলাদেশ প্রবেশ করেনি। নিজভূমিতে এমন কোনো বৈদেশিক শক্তির উপস্থিতিকেও স্বীকার করেনি, যে শক্তি ভারতরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক ভূমিকা নিতে পারে। বাংলাদেশ ঐতিহাসিকভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের থেকে একটি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছে এবং কাশ্মীর প্রসঙ্গে দেখিয়েছে এক অখণ্ড নীরবতা। প্রতিদানে ভারতরাষ্ট্র বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের উন্নয়ন ও বাণিজ্যিক সহযোগী হিসেবে ভূমিকা নিয়েছে এবং তার ভারসাম্য বিপন্ন হবার যেকোনো চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করেছে পরিস্থিতি অনুসারে। ভারতরাষ্ট্রের অখণ্ডতা, ভৌগোলিক গুরুত্ব ও উপমহাদেশে কেন্দ্রীয় ভূমিকা স্বীকার করে নেবার ফলে ভারতবর্ষের শাসকরা বাংলাদেশেকে অর্থনৈতিক ও রণনীতিগত নিরাপত্তা প্রদান করেছে।

ভারতরাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশই হল নিকটতম। স্থলভাগ-জলভাগ দুই সীমান্তে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। একমাত্র পার্থক্যসূচক বিষয় হল বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্মীয় পরিচয় ইসলাম— যে পার্থক্য এই দুই দেশের সম্পর্ককে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে।

১৯০৫ সালে ব্রিটিশরাজ বঙ্গবিভাজনের সিদ্ধান্ত নেয় মূলত প্রতিবাদী জাতীয়তাবাদী হিন্দু বাঙালিকে প্রতিরোধহীন করার লক্ষ্যে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাগুলি অবশ্য এই বিভাজনকে সমর্থন করেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাতের স্থায়ী বীজ বপন করে, যার ধারাবাহিকতায় ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলিম লীগ। ১৯৪৭ পূর্ব বাংলায় এই সাম্প্রদায়িক সংঘাতই তার বিষবাষ্পকে প্রসারিত করে— নোয়াখালি সংঘাত ও The Great Calcutta Killing-এর মধ্যে দিয়ে। পূর্ববঙ্গের মুসলিম জনসাধারণ হিন্দু জমিদার শ্রেণির প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এবং সরকারি চাকুরিসহ বুদ্ধিবৃত্তির সমস্ত ক্ষেত্রে হিন্দু প্রাধান্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। ফলত বাঙালি মুসলিম জাতীয়তা বঙ্গবিভাজনকে অনিবার্য করে তোলে এবং অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন ভেঙে গিয়ে ধর্মীয় পরিচয়ে বাঙালি মুসলিম পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে নিজের আত্মপরিচয় খুঁজে নেয়। পরবর্তী কয়েক দশক বাঙালি মুসলিমের আত্মপরিচয় সন্ধানের ইতিহাস। বাংলাদেশের সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এই আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটিকে তার দুই সুবিখ্যাত উপন্যাস *চিলেকোঠার সেপাই* ও *খোয়াবনামা*-তে উপস্থিত করেছেন এক অননুকরণীয় কায়দায়। '৪৭ পরবর্তী দশকগুলিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম মূর্ত হয়েছে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রগঠনের মধ্যে দিয়ে। 'হিন্দু ভারতের' সঙ্গে তার টানাপোড়েন কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়, তার ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

ভারতরষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে— প্রথমত, ১৯৭১ সালে ভারত-পাক যুদ্ধ ও স্বাধীনতালাভের পর্যায়; দ্বিতীয় পর্যায় বলা যায় সামরিক শাসনের বছরগুলি '৯০-এর দশক পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায় পরবর্তীকালে বহুদলীয় শাসনের সময়কাল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিপর্যয় গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে এক উল্লাসের পরিবেশ তৈরি করেছিল এবং তৎকালীন কংগ্রেসি নেতৃত্বকে এক অবিসংবাদিত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যখন আত্মসমর্পণ

করে, তখন সেই বিজয় উদ্‌যাপনের দিনে ভারতরাষ্ট্র তার সেনাবাহিনীর অফিসারদের মধ্যে থেকে হিন্দু-শিখ ও অন্য সম্প্রদায়ের কমান্ডারদের উপস্থিত করে এটা দেখানোর জন্য যে, এই বিজয় আসলে পাকিস্তানি মৌলবাদী চিন্তার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতীক। এটা দেখানোর প্রয়াস চলে যে, এই বিজয় আসলে জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বের বিরুদ্ধে এক জোরালো আঘাত এবং ভারতরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি এর ফলে জয়যুক্ত হয়েছে। মার্কিনী শক্তি ও চীনারা, যারা পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল, সেই অসম শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গড়ে ওঠা সম্ভবপর হয় এবং দেখানোর প্রয়াস চলে যে, এই নবরাষ্ট্র গঠন একান্তভাবে সম্ভব হয়েছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতীয় জনগণের অভূতপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে। এটা স্থির সত্য হিসেবে তাই ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, এই নবরাষ্ট্র ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কখনো দাঁড়াবে না এবং প্রতিদানে ভারতরাষ্ট্র তাকে নৈতিক ও বস্তুগত নিরাপত্তা প্রদান করবে।

বিচক্ষণতার সঙ্গে এটা স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, বাংলাদেশ একটি উপগ্রহ রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে এবং ভারতরাষ্ট্র তার উদারতা ও দাক্ষিণ্যের মধ্যে দিয়ে এই নবগঠিত রাষ্ট্রটির সহজাত বিবিধ সমস্যার সমাধান করবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনের জন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল পরিমাণ অর্থ। এর সঙ্গে যুক্ত হয় ভয়াবহ সাইক্লোনের আঘাত, যার ফলশ্রুতিতে জন্মলাভের পরেই প্রায় ১ কোটি মানুষ ঘরছাড়া ও বাস্তুচ্যুত হয়। পাল্লা দিয়ে বাড়ে খাদ্যসংকট ও দুর্ভিক্ষ ও সর্বোপরি ছিল শেখ মুজিবর রহমানের অপদার্থ প্রশাসন। ভারতরাষ্ট্র এই পর্যায়ে খাদ্যদ্রব্য, কাপড়, ওষুধপত্র, বাড়ি বানানোর প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রভূত পরিমাণে সরবরাহ করলেও তা কোনোভাবেই পর্যাপ্ত ছিল না।

পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার পর বাঙালি জাতীয়তাবাদী আত্মপরিচয়ও তার গতি হারায় এবং ধর্মীয় অভিমুখ ধীরে ধীরে পুনঃজাগরিত হতে থাকে। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের প্রতি যদিও শেখ মুজিবর রহমানের এক ধরনের দায়বদ্ধতা ছিল, কিন্তু তবুও ইসলাম বাংলাদেশের প্রাথমিক আত্মপরিচয় হিসেবে বিকশিত হতে থাকে এবং সৌদি আরবের মতো দেশ, যারা ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে ঋণ ও অনুদান প্রদান করে, সেই সকল ইসলামিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততা বাড়তে থাকে। মুজিব-পরবর্তী নেতৃত্বের কাছে ইসলাম একটি গতিসঞ্চারী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। পাকিস্তান এবং অন্য ইসলামিক রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক যত ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে থাকে, ততই একমাত্র কেন্দ্রীয় বন্ধু হিসেবে ভারতবর্ষের ভূমিকা দুর্বল হয় এবং বাংলাদেশী সমাজ ধর্মনিরপেক্ষতার ও বাঙালির জাতীয়তার আদর্শ থেকে গোটা ইসলামিক শক্তির প্রতি ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হতে থাকে। মুজিব হত্যার পরবর্তীকালে এই মৌলবাদী সংস্কৃতির বিকাশ তুঙ্গে ওঠে এবং সামরিক শাসনের পর্যায়কাল জুড়ে বাংলাদেশের সমাজে ভারতের জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। ভারতবর্ষের বৈদেশিক নীতির কাছে এই অবস্থা ছিল চূড়ান্ত বিজয় থেকে একেবারে সামূহিক বিপর্যয়।

বাংলাদেশ-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক

১) তিস্তা-চুক্তি

পূর্বতন UPA সরকার ও বর্তমান NDA সরকার দু-পক্ষই তিস্তা জলবণ্টন চুক্তিকে কেন্দ্র করে নিজস্ব ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছে— বিবদমান দুই পক্ষ হিসেবে এখানে থেকেছে মূলত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহাবস্থান ও সমন্বয়ের নতুন নতুন ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা মধ্যে দিয়েই যে দুই শিবিরের মধ্যে বিনিময়ের দরজা খুলতে পারে।

ভারতীয় সংবিধানের সংহিতা অনুসারে নদী ও জলের প্রশ্নটি রাজ্য তালিকাভুক্ত। আবার কেন্দ্রীয় তালিকার ৫৬ নং ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারকে জনস্বার্থে আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় তালিকার ১০ ও ১৪ নং ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বৈদেশিক বিষয়ক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ফলত সাংবিধানিকভাবে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবণ্টন সংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিকভাবে প্রয়োজন পড়ে না রাজ্য সরকারের অনুমোদন প্রার্থনা করার।

বাস্তবতা যদিও সম্পূর্ণ অন্য কথা বলে। UPA সরকারের বাধ্যবাধকতা ছিল মমতা ব্যানার্জী পরিচালিত তৃণমূল কংগ্রেস দল। কারণ সেই দল ছিল ক্ষমতার শরিক। অপরদিকে BJP শাসিত NDA সরকারের সেই বাধ্যবাধকতা না থাকলেও বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে আদর্শগত ও রাজনৈতিক মতপার্থক্য নিয়ে এত বেশি মাত্রায় সচেতন, যার ফলে বহু ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা তৈরি হয়।

দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তান ও চৈনিক আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত বাংলাদেশকে এক বিশ্বস্ত মিত্রশক্তি হিসেবে দেখে। বাংলাদেশের সঙ্গে সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন, বিশেষত শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামি লিগের সঙ্গে মিত্রতা এই বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করেছে। দক্ষিণ এশিয়ার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ঢাকার অবস্থান ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকা উত্তর-পূর্বের সঙ্গে ভারতের সংযোগকারী ও পূর্ব দুনিয়ায় ভারতের প্রবেশদ্বার। বাংলাদেশের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভারতের পক্ষে তাই কোনেভাবে সম্ভব নয় বাংলাদেশের দাবিকে উপেক্ষা করা। বিশেষত তিস্তা জলবণ্টনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দাবিকে ফেলে রাখা।

বাংলাদেশের সঙ্গে এক সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও মমতা ব্যানার্জীর সরকার জোরালোভাবে তিস্তা চুক্তির বিরোধিতা করেছে। প্রথম পর্যায়ে ৭০:৩০ অনুপাতে স্বীকৃত হলেও অর্থাৎ ৭০ ভাগ ভারতের আর ৩০ ভাগ বাংলাদেশ রাষ্ট্রের, পরবর্তী পর্যায়ে ৪০:৪০:২০ (সিকিম-পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ) অনুপাতকে মেনে নিতে তিনি অস্বীকার করেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের স্পষ্ট যুক্তি হল যে, তিস্তার জল তাদের কাছে জীবনমরণের প্রশ্ন এবং ব্যাপক প্রান্তিক চাষীর জীবিকা ও সুরক্ষার সঙ্গে বিষয়টি যুক্ত। এছাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য সিকিম জল আটকে রাখায় বিশেষ বিশেষ ঋতুতে জলের স্রোত স্বাভাবিকভাবে কম থাকে। পশ্চিমবঙ্গের পাঁচটি জেলা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং দার্জিলিং-এ প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর কৃষিজমিতে জলসেচের সঙ্গে তিস্তা যুক্ত। পূর্বে উল্লিখিত খসড়া চুক্তি অনুসারে জলবণ্টন কৃষিকার্যকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, বিশেষত উত্তরবঙ্গে বোরোধানের চাষ সমস্যার মুখে পড়বে, যে চাষে প্রভূত জলের ব্যবহার হয়।

যদিও এক্ষেত্রে অন্য কারণও বিদ্যমান। তিস্তার জল যদি বাংলাদেশ যথেষ্ট পরিমাণে পায় তবে তা মমতা ব্যানার্জীর এবং তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী রাজনীতির পক্ষে সুখকর হবে না। কারণ উত্তরবঙ্গে এই সকল জেলাগুলির প্রায় ৩০ শতাংশ আদিবাসী ও সংখ্যালঘু কৃষক। আবার অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশ থেকে চলে আসা এক বিপুল সংখ্যক হিন্দু উদ্বাস্তু ঠাঁই নিয়েছে উত্তরবঙ্গে। এই এলাকায় এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মাড়োয়ারি এবং নেপালি ও গোর্খা জনজাতির বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ও জীবিকার স্বার্থে যারা উত্তরবঙ্গে বসতি তৈরি করেছে। ঐতিহাসিকভাবে বামদুর্গ ও পরবর্তীকালে BJP-র শক্ত ঘাঁটি হওয়ার ফলে এই এলাকায় তৃণমূল দলের রাজনৈতিক প্রভাব সেভাবে থাকেনি। ২০১৭ সালে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেপালি ও গোর্খাদের

সমর্থন নিয়ে এক নতুন রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। উল্লেখিত জনজাতি বেশিরভাগ অংশ মমতা ব্যানার্জীর তথাকথিত সংখ্যালঘু তোষণনীতির বিরোধী। মুসলিম পরিচিতি সমৃদ্ধ রাষ্ট্র বাংলাদেশকে সহযোগিতার নীতি এইসকল জনজাতির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। এই রাজনৈতিক সমীকরণই তৃণমূল কংগ্রেস ও তার নেতৃত্বকে তিস্তার জলবণ্টন ও তিস্তা চুক্তি রূপায়ণে সুদৃঢ় অবস্থান নিতে দেয়নি।

২) ভারত-বাংলাদেশ স্থল-সীমান্ত সমস্যা

১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরকালীন সময়ে Radcliff Line-ই ছিল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সীমান্ত বিভাজনকারী বিন্দু। যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পরেও আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসেবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে এবং আজও বিদ্যমান। যদিও দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সম্পর্কিত সমস্যাগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল, কিন্তু তার গতি ছিল যথেষ্ট ধীর। ১৯৫৮ সালে Nehru-Noon Agreement-এর মধ্য দিয়ে সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তির প্রয়াস নেওয়া হলেও বহু কিছুই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা এক বেদনাবিধুর যাত্রাপথে খণ্ড রাজনীতি এবং অদূরদর্শিতা ও অপরিণামদর্শিতার ফলশ্রুতি যার মূল্য দিয়ে চলেছেন আজও সীমান্তের মানুষ। কাঁটাতারে বিদ্ধ ফেলানীর ক্ষতবিক্ষত দেহ এই সমস্যারই এক জীবন্ত প্রতিরূপ।

অনেক প্রতিকূলতার পথ পেরিয়ে শেষপর্যন্ত ২০১০ সালে শেখ হাসিনা ও ড. মনমোহন সিংহের মধ্যে যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, তাতে স্থল-সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধান করা হয় এবং অবাধ স্থল-বাণিজ্যের পথে যে সকল বাধা রয়েছে, তা দূর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এক ঐতিহাসিক বোঝাপড়া অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৩ সালের ৬ মে সংসদের গ্রীষ্মকালীন অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের ছিটমহল হস্তান্তরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের স্থল-সীমান্ত চুক্তি রূপায়নে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় মনমোহন সিং সরকারের বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদ সংবিধান সংশোধন বিল পেশ করতে গেলে তুলকালামের ফলে তা আলোচনা করা যায়নি। অসম গণ পরিষদের মাত্র ২ জন সাংসদ মিলে ট্রেজারি বেঞ্চে বিদেশমন্ত্রী সলমন খুরশিদের হাত থেকে সংবিধান সংশোধন বিলটি ছিনিয়ে নিতে যান। যার ফলে স্থল-সীমান্ত চুক্তি সংশোধনী বিল পাশ করা সম্ভব হয়নি।

এই পর্যায়ে সম্ভব না হলেও ২০১৫ সালের ৭ মে ভারতীয় সংবিধানের ১০০তম সংবিধান সংশোধনীর মধ্যে দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্থল-সীমান্ত সমঝোতা চুক্তিপত্রটি (Land Boundary Agreement) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি ওই একই বছরে আরও কিছুটা সংশোধিত হয়েছিল। এই চুক্তির অংশ হিসেবে ভারত ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহল, যার আয়তন প্রায় ৭১১০ একর এবং বাংলাদেশ ১১১টি ছিটমহল, যার আয়তন ১৭১৬০ একর লাভ করে। ছিটমহলের বাসিন্দাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তারা যে এলাকায় বাস করছেন, সেখানেই বাস করার বা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে দেশ বেছে নেওয়ার। ৩১ জুলাই ২০১৫ থেকে ২০১৬ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত এই হস্তান্তর প্রক্রিয়াটি চলে। এই চুক্তির ফলে ভারত বাংলাদেশের কাছে ৪০ বর্গকিলোমিটার ভূমিখণ্ড হারায়।

নিঃসন্দেহে বলা যায়, এই স্থল-সীমান্ত প্রশ্নে একটি ঐক্যমতে আসা কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ২০১৫ সালের ৬ জুন নরেন্দ্র মোদির ঢাকা সফরকালে মোদি ও শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে ও দুই দেশের বিদেশ সচিব পর্যায়ে বৈঠকের মধ্যে দিয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। দুই দেশের অফিসারদের সংযুক্ত করে সমীক্ষক টিম গড়ে তোলা হয়। এমন প্রায় ৭৫টি টিম, যা একজন ভারতীয় ও একজন বাংলাদেশি অফিসারকে যুক্ত করে তৈরি করা হয়েছিল, তারা এই জটিল সমীক্ষার কাজ ও এই এলাকার মানবসম্পদের সামগ্রিক দাবিগুলি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। ২০১৫ সালের ১৩ জুলাই ভারতীয় ছিটমহলে অবস্থিত ১০০টি পরিবার ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন জানায়। যদিও ভারতের কাছে হস্তান্তরিত বাংলাদেশি ছিটমহলে কেউই বাংলাদেশ ফিরে যাবার প্রার্থনা জানায়নি। এই পর্যায়ে ১৪,০০০ মানুষ ভারতীয় নাগরিক হিসেবে এবং ৩৬,০০০ মানুষ বাংলাদেশি নাগরিক হিসেবে নিজেদের যুক্ত করেন।

৩) বাণিজ্য ও পরিবহন

দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র উন্নয়নশীল রাষ্ট্র। বিপরীতে জনসংখ্যা, ভৌগোলিক আয়তন এবং অর্থনৈতিক আয়তনের বিচারে ভারতের সঙ্গে এর কোনো তুলনা চলে না। ভারত হল সারা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ জনসংখ্যাবিশিষ্ট রাষ্ট্র এবং দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর অর্থনীতি। অন্যদিকে বাংলাদেশ ভারতের দ্বারা উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে বেষ্টিত, দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর এবং দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার। শারীরিকভাবে ভারতের নিকটবর্তী হওয়ায় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক হওয়ায় এটা খুবই স্বাভাবিক যে বৃহত্তম প্রতিবেশীর সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকবে। তাই এটা একেবারে আশ্চর্যজনক নয় যে, ভারত হল বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক সহযোগী।

তথ্য ও অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে যে, বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের থেকে অনেক শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে ভারত। সর্বোপরি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ভারত বাংলাদেশকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখার ক্ষমতা রাখে, যা বাংলাদেশের বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যিক ঘাটতির কারণ। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের শুধু ভৌগোলিক সম্পর্কই নয়, ভাষাগত, ধর্মগত, সাংস্কৃতিক অভ্যাস, খাদ্যাভ্যাস এবং উৎসবেরও সাদৃশ্য রয়েছে। সাংস্কৃতিক এই বন্ধনে দুই দেশের মানুষের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে অর্থনৈতিক বন্ধন ও বাণিজ্যকে নিবিড় করেছে। সর্বোপরি, দুই দেশই বেশ কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠনে একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন United Nations Conterence and Trade and Development (UNCTAD), World Bank, IMF and WTO। এছাড়াও দুই দেশই SAARC এবং BIMSTEC-এর মতো আঞ্চলিক জোটে যুক্ত। সর্বোপরি, বিশ্বব্যাঙ্ক দক্ষিণ এশিয়ার দুই দেশকেই এক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নশীল সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করে।

ভারত বাংলাদেশের তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং জাতিগত বিভিন্নতা যেমন অনেক বেশি, তেমনি শ্রম সম্পর্ক ও শ্রমিকের দক্ষতার মানে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে থাকা অবস্থানে অবস্থিত। একইসঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা, স্থায়ী ও সুস্বীকৃত গণতান্ত্রিক অনুশীলন এবং শক্তিশালী পরিকাঠামো ও সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের অবস্থান রয়েছে। বাংলাদেশ সেদিক থেকে দেখলে কিছু বিভিন্নতা সত্ত্বেও একটি সমসত্ত্বাবিশিষ্ট রাষ্ট্র, যে দেশে দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার অভাব লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি, প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদের দিক থেকে জঙ্গল-নদী-পাহাড় সমাকীর্ণতার দিক থেকে ভারত বাংলাদেশের থেকে বহুগুণ এগিয়ে।

এই সকল সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি দুই দেশের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। সাদৃশ্যর দিক থেকে বলা যায়, দুই দেশেই সস্তা শ্রমিকের উপস্থিতির কারণে শ্রমনিবিড় পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দুই দেশেরই আগ্রহ থেকেছে। বস্ত্র শিল্প ও চর্ম শিল্পের ক্ষেত্রে দুই দেশেরই বাণিজ্যিক বিনিয়োগ থেকেছে। অন্যদিকে, বৃহৎ প্রতিযোগী হওয়ার কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হিসেবে ভারতের ভূমিকা সবসময় আলোচ্য বিষয়।

Rather and Gupta ২০১৪ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যেকার সহযোগিতামূলক সম্পর্ক কীভাবে সীমান্ত পেরিয়ে বাণিজ্যের বিকাশ ঘটাতে পারে এবং এই বিকাশ কীভাবে বাংলাদেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বাণিজ্যিক ঘাটতিকে কমিয়ে আনতে পারে, তার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, বিশেষত আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ও মিজোরামের সঙ্গে বাণিজ্যের বিকাশ কীভাবে ওই সকল এলাকার রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, তার উল্লেখ করেছেন।

নিরাপত্তা— সামরিক ও অসামরিক

সরকারিভাবে অনুমান করা হয় ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ নাগরিক ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ অন্য অংশে প্রবেশ করে। ভারতবর্ষের বড়ো শহরগুলিতে এই অভিবাসী বাংলাদেশি নাগরিকরা সস্তা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। দীর্ঘদিন ধরে এই অভিবাসনের ফলে এদেশের বেশ কিছু রাজ্যে জনঘনত্বের ও জনবিন্যাসের যেমন পরিবর্তন হয়েছে, তেমনই এদের হাত ধরে অস্ত্র ও জাল নোটের বেআইনি কারবার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ভারতবর্ষের নিরাপত্তা সংস্থাগুলির অভিমত। গবেষণার এই পর্যায়ে তথ্য সমৃদ্ধ বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এই অভিবাসনের রাজনৈতিক ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা কীভাবে প্রভাব ফেলছে তথ্যসহকারে তা আলোচনা করা হয়েছে।

একইসঙ্গে জঙ্গি মৌলবাদের বিস্তার, বিশেষত বাংলাদেশে মুসলিম সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলির বাড়বাড়ন্ত ও ভারতবর্ষে হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনগুলির উত্থান উপমহাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবেশটিকে বিঘ্ন করছে ও গণতন্ত্রের প্রসারকে করছে সংকুচিত। জামাত-ই-ইসলামি, হুজি, JMB সহ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু জনসাধারণের উপর বারংবার আক্রমণ চালিয়েছে, যার প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম জনগোষ্ঠীভুক্ত মানুষ আক্রান্ত হয়েছেন এবং বিপরীতটিও ঘটেছে। বাংলাদেশি সমাজের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার পরিবেশকে বিঘ্নিত করার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। ইসলামিক শক্তিগুলি যেহেতু উত্তর-পূর্বাঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ ও সীমান্তবর্তী জেলাগুলিকে তাদের Transit point হিসেবে ব্যবহার করে সেক্ষেত্রে দুই দেশের যৌথ বোঝাপড়া আঞ্চলিক নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের শিলিগুড়ি, যাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রবেশদ্বার বলা হয় এবং অনেকগুলি রাজ্যের সীমান্ত নিকটবর্তী হওয়ায় শিলিগুড়ি শহরের তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই শহরকে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি যথেষ্ট ব্যবহার করতে পারছে তাদের বাণিজ্য ও যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে।

আঞ্চলিক ভূ-রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে চীনের গুরুত্ব অস্বীকার করা ভারতের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। বিশেষত গণপ্রজাতন্ত্রী চীন ভারতবর্ষের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির ওপর যখন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাববৃদ্ধির প্রয়াস করে যাচ্ছে ও তার জন্য রণনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে যাচ্ছে। বিশেষত পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কাকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সাহায্য ও বাংলাদেশের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে চীন নেতৃত্বকারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করছে। বিগত দশকগুলিতে ভারতের সঙ্গে তার সীমান্ত সংঘর্ষের মাত্রা ও পরিমাণ দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ভারত দক্ষিণ এশিয়ার মার্কিন কূটনৈতিক ও রণনৈতিক সম্পর্কের অংশীদার এবং পশ্চিমী শক্তি জোটের সঙ্গে তার এক ঐতিহাসিক সম্পর্ক ও দায়বদ্ধতা রয়েছে। ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সামরিক ও অসামরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে যে ভেদ বিন্দুগুলি রয়েছে তার পুনর্মূল্যায়ন তাই একান্ত জরুরি, যাতে দুই দেশ এক শক্তিশালী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও নতুন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূচনা করতে পারে। বর্তমান গবেষণায় চেষ্টা করা হয়েছে এই সম্ভাবনার দিকগুলিকে নতুনভাবে উদ্ভাসিত করার।

আঞ্চলিক জোট

SAARC-র হাত ধরে কতদূর পর্যন্ত আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোট সংহত হয়েছে তা বিশেষ পর্যালোচনার দাবি রাখে। যেমন ২০১৪ সালে কাঠমান্ডুতে ১৮তম সার্ক সম্মেলনে প্রস্তাবিত SAARC— Motor Vehicle Agreement, যা দক্ষিণ এশিয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার গতি সঞ্চারের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত হয়েছিল, তাতে বাকিদের সম্মতি থাকলেও শুধুমাত্র পাকিস্তানের বিরোধিতায় তাকে রূপায়িত করা যায়নি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা অপর শক্তিজোট BIMSTEC-এর ভূমিকাও পর্যালোচনায় আসবে, কারণ দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতির পরিবেশকে বজায় রাখা এই জোটেরও অন্যতম রাজনৈতিক লক্ষ্য।

জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময়ে গড়ে উঠেছিল সার্ক, যিনি সামরিক শাসক ছিলেন। এই সময় ছিল সেই সময় যখন ঠান্ডা যুদ্ধের বাস্তবতা ছিল এবং ভারত ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন। পশ্চিমী শক্তি জোটের অংশীদার হিসেবে ভারত সেই সময় জেনারেল জিয়াকে দেখত, ফলত প্রথম পর্যায়ে জেনারেল জিয়ার উদ্যোগে গড়ে ওঠা SAARC সম্পর্কে একধরনের নির্লিপ্ত মনোভাব ভারতের দিক থেকে ছিল প্রধান।

যদিও পরবর্তীকালে এই ভূমিকা পরিবর্তিত হয় এবং যৌথ অংশীদারিত্বের যে যে বিষয়ে SAARC প্রতিশ্রুত ছিল, সেইসকল ক্ষেত্রে দুই দেশের পারস্পরিক আস্থা ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত কতগুলি কারণে SAARC-এর ভূমিকা ফলপ্রসূ হতে পারেনি।

প্রথমত, বাংলাদেশ ভারতকে বরাবরই 'Big Brother' হিসেবে দেখে ও স্থায়ী রাজনৈতিক মঞ্চে ভারতের ভূমিকাও বহু ক্ষেত্রে এই অনুমানকে সঠিকতা দেয়। এর অর্থ হল বাংলাদেশ সহ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি মনে করে যে, ভারত এই শক্তি জোটে অংশগ্রহণ করেছে একমাত্র তার সম্প্রসারণবাদী লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

দ্বিতীয়ত, SAARC-এ সার্বজনীন ঐকমত্য সম্ভব না হলে তা নিরসন করার কোনো কার্যকরী উপায় নেই। SAARC-এর বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়েছে এর ফলে।

তৃতীয়ত, এই ব্যর্থতার ফলে SAARC-এর বিপরীতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিকাশ ঘটেছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলির পরস্পরের মধ্যে বিতর্ক দেখা দিলে SAARC-বহির্ভূত দ্বিপাক্ষিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে তারা সমস্যা সমাধানের প্রয়াস চালিয়েছে। উল্লেখিত কারণগুলি ছাড়াও আরও বহুবিধ কারণ রয়েছে যা গবেষণার পর্যায়ে উপস্থিত করা হয়েছে মূলত একটি শক্তিশালী আঞ্চলিক শক্তিজোট গড়ে তোলার পথে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা পুনরাবিষ্কারের লক্ষ্যে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে BIMSTEC-এর ভূমিকা আলোচনা সাপেক্ষ। ভারতের Act East Policy-র সাফল্যের জন্য যেমন BIMSTEC গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তেমনই SAARC-এর দুর্বলতার কারণগুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে এই শক্তিজোটকেও শক্তিশালী করা সম্ভব বলে অনেকেই মনে করেন। নৌবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগরের গুরুত্ব যেহেতু উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং চট্টগ্রাম বন্দর একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক বন্দর হিসেবে যেখানে আবির্ভূত হতে চলেছে, সেখানে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলিকে আরও বেশি সম্প্রসারিত করার জন্য BIMSTEC-এর মতো সংগঠনের রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া BBIN-এর মতো সংগঠনগুলিকে বিকল্প হিসেবে গড়ে তোলার কতদূর সম্ভাবনা রয়েছে তাও বিশেষরূপে আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণায়।

উপসংহার

ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এক ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে গেছে বিগত ৫০ বছরের দীর্ঘ সময়কালে। এই সম্পর্ক মাঝে মাঝে বিঘ্নিত হলেও সহযোগিতার মূল স্বরটি অক্ষুণ্ণ আছে বলেই রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন। বর্তমান গবেষক দুই রাষ্ট্রের মধ্যেকার এই ঘাত-প্রতিঘাত ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যেও মিলনের সুরটিকে উপলব্ধি করার চেষ্টা চালিয়েছে ও সাধ্যমতো সত্যে উপনীত হয়েছে বলে বিশ্বাস।

পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহে উপনীত হওয়া গেছে। প্রথমত, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের বিকাশের জন্য ভারত রাষ্ট্রকে তার প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ককে শুধুমাত্র ব্যবহারিক উপযোগিতাবাদী রণকৌশলগত বোঝাপড়ার নিরিখে নয়, এক রণনৈতিক সম্পর্কে উন্নীত করতে হবে, যার ভিত্তি হবে পারস্পরিক মর্যাদা ও সহানুভূতি।

দ্বিতীয়ত, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে একটি স্বনির্ভর আত্মনির্ভরশীল ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান উন্নয়নশীল রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে নিজেকে বিকশিত করতে হবে, যাতে এই সমমর্যাদার মাত্রাটি বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, গণতন্ত্র ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার যে যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, তা রোধ করতে হবে এবং নিজ নিজ দেশে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের প্রসার ঘটাতে হবে।

চতুর্থত, বৃহৎ শক্তির প্রভাবমুক্ত একটি আঞ্চলিক শক্তিজোট তখনই গড়ে উঠবে, যখন অর্থনীতি-রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার দিকগুলি প্রসারিত হবে ও সুস্থায়ী কূটনৈতিক সম্পর্কের নির্মাণ হবে। বর্তমান গবেষণা গ্রন্থটি এই নির্মাণকার্যে যদি সামান্য সূত্রধরের ভূমিকা নেয়, তবেই এই প্রকল্পের সফলতা।